ঋগ্বেদ ও উপনিষদের স্বরূপ ও বঙ্গানুবাদ প্রসঙ্গ

শেখ সাবির আলি

কথামুখ

বেদকে সম্পূর্ণরূপে জানার জন্য ঋষি ভরদ্বাজ ইন্দ্রের কাছে আরও একশত বছর আয়ু প্রার্থনা করেছিলেন। অতিরিক্ত একশো বছরের শেষলগ্নে আবারও একশত বছর আয়ু প্রার্থনা করলেন। এরকম পাঁচবার প্রার্থনা করলে ইন্দ্র ভূ, ভুবঃ, স্বঃ এই তিনটি ব্যাহৃতি উচ্চারণের সাথে তিন পর্বত সৃষ্টি করলেন এবং তাঁকে বললেন, ভরদ্বাজ ঋষি অতিরিক্ত আয়ু লাভ করে বেদকে যে জানতে পেরেছেন, তা আসলে এই তিন পর্বতের থেকে আনা তিন মুঠো ধূলিকণার সমান। বেদকে সম্পূর্ণরূপে জানা প্রায় অসম্ভব। কেননা, "অনন্তা বৈ বেদাঃ" অর্থাৎ বেদ হল অনন্ত। শাস্ত্রীয় ঐতিহ্য অনুসারে বেদ অধুনা দৃশ্যমান গ্রন্থ নয়, বরং তা হল জ্ঞানরাশি। আর সেই অনন্ত জ্ঞানরাশি পরমাত্মাই অশেষবেদপ্রতিপাদ্য।

ব্যাকরণের দিক থেকে 'বেদ' শব্দটিকে দুইরকম প্রত্যয়ের যোগে নিষ্পন্ন করা যায়। জ্ঞানার্থক 'বিদ্' ধাতুর উত্তরে 'নন্দিগ্রহিপচাদিভ্যো ল্যুণিন্যচ:' (৩.১.১৩৪.) এই সূত্রে পচাদি 'অচ্' প্রত্যয় করে বেদপদটি নিষ্পন্ন হয়। 'চিত:" (৬.১.১৬৩.) [সবশেষে টীকা অংশ দ্রষ্টব্য] এই স্বরসূত্র অনুসারে বেদশব্দটি অন্তোদাত্ত হওয়ার কথা। কিন্তু বৃষাদিগণে 'বেদ' অন্তোদাত্ত। আবার, বেদ শব্দের দ্বারা দর্ভময় সম্মার্জনের সাধনবিশেষকে বোঝানো হয়। 'বেদং কৃত্বা বেদিং করোতি' এই শ্রুতিবাক্যে 'বেদ' পদটি দর্ভময় সম্মার্জনের (পরিষ্কার করার) সাধন অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। এখানে বলা হচ্ছে যে, 'দর্ভময় ঝাড়ু নির্মাণ করে বেদি নির্মাণ করবে'। জৈমিনীয়ন্যায়মালাবিস্তরে বলা হয়েছে — "বেদং কৃত্বা বেদিং করোতি' ইতি শ্রুতৌ পূর্বকালবাচিনা ক্ত্বাপ্রত্যয়েন ক্রম: প্রতীয়তে। বেদো নাম দর্ভময়ং সংমার্জনসাধনম্ বেদি: আহবনীয়গার্হপত্যমধ্যবর্তিনী ভূমি:"। অধ্বরমীমাংসাকুতূহলবৃত্তিতে বলা হয়েছে —'বেদো নাম দর্ভময়ং সম্মার্জনসাধনম্' (১.৩.৪.)। আবার বেদ শব্দের দ্বারা 'শয়ান (শুয়ে আছে এমন) বৎসের জানুর আকৃতিসদৃশ দর্ভমুষ্টিবিশেষও' বোধিত হয়। ব্যুত্পত্তির দ্বারা এরূপ অর্থ পাওয়া যায় না। তাই এই অর্থে বেদশব্দটিকে অব্যুত্পন্ন বা ঐ অর্থে রূঢ বলে ধরা যায়। প্রশ্ন হয় এরকম অর্থ কোথায় প্রসিদ্ধ? এর উত্তরে বলা যায় যে, এবিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ। তাই অধ্বরমীমাংসাকুতূহলবৃত্তিতে (১.৩.৫.) বলা হয়েছে — 'বেদো নাম শয়ানবত্সজান্বাদ্যাকৃতিবিশিষ্টো দর্ভমুষ্টিবিশেষ:'। এই

দর্ভ যাগরূপ বৈদিক কর্মের উপকারক হয়। তাই এখানে উক্ত বেদ পদটির দ্বারা প্রাথমিকভাবে দর্ভমুষ্টিবিশেষকে বোঝালেও, যাগাদি বৈদিক কর্মকাণ্ড উপলক্ষিত হয়। পূর্বে জ্ঞানার্থে প্রযুক্ত বেদশব্দটি জ্ঞানকাণ্ডের উপলক্ষণ আর কুশবিশেষ অর্থে প্রযুক্ত বেদশব্দটি কুশোপলক্ষিত কর্মের বোধক। প্রসিদ্ধ যে বেদ কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের সমুদায়রূপ। হস্তগত সাহিত্যরূপ শব্দাত্মক বেদ, ঠিক জ্ঞানপর নয়। বরং জ্ঞানের প্রতিপাদক বটে।

ঐতিহ্যগতভাবে বেদকে সংহিতা ও ব্রাহ্মণ এই দুইভাগে বিভক্ত করা হয়। ব্রাহ্মণ অংশকে পুনরায় তিনটি উপবিভাগে বিভক্ত করা হয় — ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্। বেদের সংহিতা ভাগটি প্রধানতঃ মন্ত্রগুলির সমূহমাত্র। প্রত্যেক সংহিতাতে এক একটি ব্রাহ্মণ সম্বদ্ধ। ব্রাহ্মণভাগে যাগাদি কর্মের বিবরণ মুখ্যতঃ প্রতিপাদিত হয়েছে। উপনিষদ্ ভাগে দার্শনিক আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রতিপাদন হয়েছে। আর আরণ্যকের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ ভাগের মাঝে। কতকগুলি আচার অনুষ্ঠান, কতকগুলি গুপ্ত রহস্যপূর্ণ ও প্রতীকধর্মী ব্যাখ্যা এখানে প্রতিপাদিত হয়েছে। ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ এগুলি পরস্পর যুক্ত। আরণ্যক ব্রাহ্মণের উপাঙ্গ আর উপনিষদ্ আরণ্যকের অন্তর্গত বা আরণ্যকের সঙ্গে সংযুক্ত। তাই বিন্যাসের দিক থেকে আরণ্যকগুলি ব্রাহ্মণেরই সম্প্রসারণ এবং উপনিষদের পূর্ববর্তী অংশ।

ঋগ্বেদ

ভারতীয় আর্যদের অদ্যাপি বর্তমান ও সাহিত্যিক রচনার প্রাচীনতম নিদর্শন হল ঋগ্বেদ। প্রাচীন সংস্কৃতি ও ধর্মের বাস্তুগৃহ হল এই বৈদিকবাঙ্ময়। ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব এই চারপ্রকার বেদ। বেদ মীমাংসকমতে কোনো পুরুষের রচিত নয়। তাই মীমাংসাগ্রন্থে তাকে অপৌরুষেয় বলা হয়েছে। লৌগাক্ষিভাস্কর অর্থসংগ্রহে বেদের লক্ষণ করেছেন, "অপৌরুষেয়ং বাক্যং বেদঃ"। বেদে যে কঠ, কৈথুম প্রভৃতি ঋষির কথা পাওয়া যায়, তাঁরা ঐ ঐ অংশের দ্রষ্টা মাত্র, রচয়িতা নন। কিন্তু নৈয়ায়িকাদি দার্শনিকমতে বেদ পৌরুষেয় (পুরুষরচিত), তবে তা ঈশ্বরমুখনিঃসৃত। প্রতীচ্যগণ রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থের মতোই বেদের রচনা কাল নির্ণয়ে উৎসাহী হয়েছেন। সকলেই তার কাল খ্রীষ্টপূর্বাব্দ বলে স্থির করলেও কোনো নির্দিষ্ট কালরেখা নিশ্চিত করতে পারেননি।

ঋক্ বলতে মন্ত্রকে বোঝায়। জৈমিনি সূত্র করেছেন — "তত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা ঋক্" (২.১.৩৫.)। কতকগুলি মন্ত্রের সমষ্টিই হয় সূক্ত। কতকগুলি সূক্ত নিয়ে হয় অনুবাক। আর কতকগুলি অনুবাকের সমষ্টি হয় মণ্ডল। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাপরিবারের অন্তর্গত ভাষাসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম নিদর্শন হল ঋগ্বেদ। ঋক্

সংহিতাকে দুরকমভাবে ভাগ করা হয়। মণ্ডল, অনুবাক, সূক্ত ও ঋক্ — এই একপ্রকার বিভাগ। ঋক্ সংহিতায় মোট ১০টি মণ্ডল, ২৫টি অনুবাক্, ২০১৭টি সূক্ত, ১০৪৭২টি ঋক্ রয়েছে। এছাড়া ২১টি বালখিল্য সূক্ত ও কতকগুলি খিলসূক্ত রয়েছে। আবার অষ্টক, অধ্যায়, বর্গ ও মন্ত্র — এভাবেও বিভাগ করা যায়। এই বিভাগ অনুসারে ৮টি অষ্টক, ৬৪টি অধ্যায়, ২০০৬টি বর্গ বর্তমান। ঋক্ সংহিতার কতকগুলি শাখা ছিল। কূর্মপুরাণে ২১টি, বিষ্ণুপুরাণে ৯টি ও বাক্যপদীয়ে ১৫টি শাখার কথা পাওয়া যায়। বর্তমানে শাকল ও বাস্কল এই শাখাদুটি হস্তলব্ধ হয়। ঋষিগণ হলেন মন্ত্রের দ্রষ্টা — 'দর্শনাৎ ঋষিঃ'। ঋক্ সংহিতার দ্বিতীয় হতে অষ্টম পর্যন্ত ৭টি মণ্ডলের ৭টি ঋষিকুলের দৃষ্ট মন্ত্ররাশি সংগৃহীত হয়েছে —এই ৭ জন ঋষি হলেন যথাক্রমে গৃত্সমদ, বিশ্বামিত্র, বামদেব, অত্রি, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ ও কণ্ব। এই মণ্ডলগুলিকে গোষ্ঠীমণ্ডল বলা হয়।

সাধারণতঃ প্রত্যেক মন্ত্রেরই যাগাদিকর্মে বিনিয়োগ লক্ষ্য করা যায়। যাগ বলতে দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যবিশেষের ত্যাগকে বলা হয়। "দেবতোদ্দেশ্যকদ্রব্যত্যাগঃ যাগঃ"। তাই মন্ত্রগুলিতে দেবতাবিশেষের স্তুতি থাকে। কিন্তু এমন কিছু সূক্ত রয়েছে, যে সূক্তগুলির অন্য প্রকার মাহাত্ম্য রয়েছে। কিন্তু নীতিমূলক সূক্ত, নারাশংসী সূক্ত, দানস্তুতি পাওয়া যায়, সেগুলি কোনো ধর্মাচরণবিশেষের সঙ্গে যুক্ত তা বলা যায় না। এদের ধর্মনিরপেক্ষ সূক্ত (secular Hymns) বলা হয়। এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল নবম মণ্ডলের ১১২ নং সূক্ত, দশম মণ্ডলের ১১৭ নং সূক্ত, ৩৪ নং সূক্ত (অক্ষসূক্ত), দশম মণ্ডলের ৮৫ নং বিবাহ বিষয়ক সূক্ত ইত্যাদি। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৭৯ নং সূক্ত, দশম মণ্ডলের ১০,৫১,৫২,৮৬,৯৫,১০৮ নং সূক্তগুলি কথোপকথনস্বরূপ। এদেরকে সংবাদসূক্ত বলা হয়। এই ধর্মনিরপেক্ষ সূক্তগুলি ও সংবাদসূক্তগুলি পরবর্তীকালীন সংস্কৃত মহাকাব্য ও নাটকের উৎস। ভিন্টারনিৎস বলেছেন — This ancient ballad poetry is the source both of the epic and of the drama (HIL, vol I, p 90).

কিছু সূক্ত আছে যেখানে দার্শনিক আলোচনার রসদ রয়েছে। যেমন পুরুষসূক্তে (১০/৯০) এক বিরাট্ পুরুষ হতে সমস্ত প্রাণীকুল ও জড়জগতের উৎপত্তি প্রতিপাদিত হয়েছে। সাংখ্য, বেদান্ত সম্মত সৎকার্যবাদের বীজ নাসদীয়সূক্তে (১০/১২৯) বর্তমান। দেবীসূক্তে (১০/১২৫) অভিন্ন ঈশ্বর চৈতন্যই যে সমস্ত ভূতে বিদ্যমান তা প্রতিপাদিত হয়েছে।

প্রত্যেক শাখার বেদের সঙ্গে এক একটি ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক সম্বদ্ধ। ঋক্ বেদের ২টি ব্রাহ্মণ —ঐতরেয় ও কৌষীতকি। কৌষীতকি ব্রাহ্মণকে শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণও বলা হয়। দুটি আরণ্যক বিদ্যমান —ঐতরেয় ও কৌষীতকি। ঐতরেয় আরণ্যক ৫টি ভাগে বিভক্ত। তার তৃতীয় ভাগের শেষ অংশ হল ঐতরেয়োপনিষদ্। আবার কৌষীতকি

ব্রাহ্মণের সম্বন্ধ হল কৌষীতকি আরণ্যক, তা ১৫টি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। এই আরণ্যকের শেষ অংশ হল কৌষীতকি উপনিষদ্।

মন্ত্রের ব্যাখ্যার জন্য ও যজ্ঞে প্রয়োগের নির্দেশের জন্য ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক ভাগের উদ্ভব হয়েছে। তাই সংহিতা ভাগেরই প্রাশস্ত্য থাকায় এদের মধ্যে সর্বত্র ঋগ্বেদেরই প্রথমে উল্লেখ হয়। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে রয়েছে —

"তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।/ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়ত"।। ইতি। (১০/৯০/৯)

আবার, নারদ সনৎকুমারের কাছে অধ্যয়ন করতে চেয়ে তিনি কী কী গ্রন্থরাশি এর পূর্বে অধ্যয়ন করেছেন, তা প্রকাশ করেন — "ঋগ্বেদং ভগবোধ্যেমি যজুর্বেদং সামবেদমাথর্বণং চতুর্থম্ —" ইত্যাদি । এখানেও প্রথমে ঋগ্বেদেরই উল্লেখ তিনি করেন।

তৈত্তিরীয়গণও বলেন, "যদ্ বৈ যজ্ঞস্য সাম্না যজুষা ক্রিয়তে, শিথিলং তদ্ যদৃচা তদ্ দৃঢম্ ক্রিয়তে" অর্থাৎ যজ্ঞবিষয়ে সামবেদ ও যজুর্বেদ যা করে, তা শিথিল। কিন্তু তার দৃঢ়তা ঋগ্বেদের দ্বারাই উপপন্ন হয়। সুতরাং, সর্বত্র ঋগ্বেদের অভ্যর্হিতত্ব থাকায় সকল অনুবাদের মধ্যে ঋগ্বেদের অনুবাদ চর্চার বিষয় হয়েছে।

ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ প্রসঙ্গ

বাংলা ভাষায় ঋগ্বেদের প্রথম অনুবাদ করেছিলেন রমেশ চন্দ্র দত্ত (জন্ম : ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ, ১৩ আগষ্ট, মৃত্যু : ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ, ৩০ নভেম্বর)। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় স্কুলের মধ্যে প্রথম স্থানাধিকারী, ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ফার্স্ট পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী, ইংল্যাণ্ডে পাড়ি দিয়ে আই.সি.এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ আর. সি. দত্তের ১৮৭১ সালে প্রথমে সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মজীবনের আরম্ভ, পরে বিভিন্ন জেলার ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেট রূপে যোগদান, কখনও বিভাগীয় কমিশনারের দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে সাহিত্যের প্রতি তাঁর অবন্ধ্যা প্রতিভা প্রভৃতি তাঁর বর্ণবহুল জীবনের পরিচয়কে প্রকাশিত করে। তাঁকে একদিকে উচ্চ মাত্রার দক্ষ প্রশাসক, গিফ্টেড রাইটার ও যথার্থ দেশপ্রেমিক বলে জানা যায়। দীর্ঘ প্রশাসনিক কাজের মধ্যে দুবছরের ছুটিতে (১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ – ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ) সাহিত্য রচনায় নিজে নিমগ্ন হন। এই সময়েই তাঁর ঋগ্বেদের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এটি ছিল ঋগ্বেদের বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ অনুবাদ। — "It is the only complete translation of the Rig-Veda hymns published in the Bengali language."

প্রথমতঃ অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে যেখানে প্রয়োজন হয়েছে, সেখানে অন্য শাস্ত্র ঘেঁটে প্রাসঙ্গিক তথ্য পরিবেশন করেছেন। সপ্তম মণ্ডলের দ্বিতীয় অনুবাকের অষ্টাদশ

সূক্তে ষষ্ঠ মন্ত্রে তুর্বশ রাজার কথা বলা হয়েছে। তিনি ধন প্রাপ্তির জন্য সুদাস নামক তাঁর সখার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। কিন্তু মূলমন্ত্রে সুদাসের কথা উল্লিখিত হয়নি। সায়ণাচার্য তাঁর ভাষ্যে উল্লেখ করেছেন। রমেশ চন্দ্র দত্তও সেই তথ্যের উল্লেখ করেছেন পাদটীকাতে। কখনও যাস্কাচার্যের নিরুক্ত, কখনও অধ্যাপক রথ, রসেন, মুর, ম্যাক্সমূলর প্রভৃতি পাশ্চাত্য সংস্কৃতানুরাগী পণ্ডিতদের কৃত অনুবাদের উল্লেখ করেছেন। প্রয়োজনীয় স্থলে মতান্তরেরও উপস্থাপনা করেছেন। কখনও তৈত্তিরীয় সংহিতা থেকে, কখনও শতপথ ব্রাহ্মণ থেকে, কখনও ইতিহাস থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্যের পরিবেশন করেছেন। এর ফলে তাঁর অনুবাদ অনুবাদমাত্র থাকে নি। আরও এই যে, অনুবাদ হলেও পাদটীকাতে নানা প্রাসঙ্গিক তথ্যের পরিবেশন থাকায় কেবল প্রথম অনুবাদ বলে নয়, পরবর্তীকালীন অন্যান্য অনুবাদের অপেক্ষাতেও এই বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষ রয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ তিনি সায়ণাচার্যের ভাষ্য অনুসরণ করে অনুবাদ করলেও কখনও কখনও সায়ণাচার্যের অর্থ রেখেও মন্ত্রের প্রাকৃতিক অর্থ নির্ণয় করেছেন। মন্ত্রের সাক্ষাৎ অনুবাদে সেই প্রাকৃতিক অর্থ না বললেও পাদটীকাতে সেই কথা বলেছেন। যেমন ঋগ্বেদ সংহিতার পঞ্চম অষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ে (সপ্তম মণ্ডলের ৩৩ নং সূক্তে) নবম থেকে ত্রয়োদশ মন্ত্রে বশিষ্ঠের জন্মবিষয়ে একটি আখ্যানের উল্লেখ আছে। সেখানে বশিষ্ঠকে মিত্র ও বরুণের সন্তান এবং উর্বশী হতে উৎপন্ন বলে বলা হয়েছে। এরকম বৈদিক আখ্যান যা ঋগ্বেদসংহিতায় কথিত হয়েছে, তা সায়ণভাষ্যেও প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় অন্য প্রাকৃতিক অর্থও প্রকাশিত করেছেন। তিনি বলছেন, "বসিষ্ঠ শব্দের আদি অর্থ বসুতম অর্থাৎ উজ্জ্বলতম অর্থাৎ সূর্য। মিত্র ও বরুণ যথাক্রমে হলেন দিবা ও রাত্রি। উর্বশীর আদি অর্থ ঊষা। অতএব বসিষ্ঠ মিত্র ও বরুণের পুত্র এবং উর্বশী হতে জাত। দিন ও রাত্রির অতিক্রম হলে ঊষালগ্নে অর্থাৎ ঊষার গর্ভে (ঊষার পশ্চাতে) সূর্যের উদয় হয়। বসিষ্ঠের জন্মসংক্রান্ত এই বৈদিক আখ্যানের এই হল প্রকৃতিসম্বন্ধী অর্থ"। (ঋগ্বেদসংহিতা পঞ্চম অষ্টক, রমেশচন্দ্রদত্ত কর্তৃক অনূদিত ৯৬৮ পৃষ্ঠা)

তৃতীয়তঃ কিন্তু কখনও আবার সায়ণাচার্যের ভাষ্যের সঙ্গে রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদ ও পাদটীকায় পরিবেশিত তথ্যের মধ্যে বিরোধ লক্ষিত হয়েছে। ঋগ্বেদের পঞ্চম অষ্টকের চতুর্থ অধ্যায়ের ৩৬ নং সূক্তের ষষ্ঠ মন্ত্র উদাহরণ হিসেবে দেখা যেতে পারে।

"আ যৎ সাকং য়শসো বাবশানাঃ সরস্বতী সপ্তথী সিন্ধুমাতা।/যাঃ সুস্বয়ন্ত সুদুঘাঃ সুধারা অভি স্বেন পয়সা পীপ্যানাঃ"।।

এখানে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদের অন্বয়ার্থ হল — "যৎ সিন্ধুমাতা সরস্বতী সপ্তথী সুদুঘাঃ সুধারাঃ সুস্বয়ন্ত"

অর্থাৎ যে নদীদের মধ্যে নদীদের মাতৃস্বরূপা সরস্বতী সপ্তমস্থানীয়া, সেই শোভন কামদোহনকারী অর্থাৎ শোভন কামনা পূর্ণ করতে সমর্থ, শোভন ধারাযুক্ত নদীগুলি প্রবাহিত হোক।

সায়ণাচার্যও এই অর্থ করেছেন —

"যৎ যাসাং গঙ্গাদীনাং নদীনাং মধ্যে সিন্ধুমাতা অপাং মাতৃভূতা সরস্বতী এতদাখ্যা নদী সপ্তথী সপ্তমী ভবতি, সুদুঘাঃ কামান্ দোগ্ধুং সুশক্যাঃ সুধারাঃ শোভনধারোপেতাশ্চ নদ্যঃ সুষ্বয়ন্ত সুষ্বয়ন্তে গতিকর্মৈতততৎ। প্রবহন্তি"। ইতি।

এখানে স্পষ্টতঃ বোঝা যাচ্ছে যে, সরস্বতী নদীর বিশেষণবোধকরূপে 'সিন্ধুমাতা' ও 'সপ্তথী' এই দুটি পদ ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে সরস্বতীকেই সিন্ধুদের অর্থাৎ নদীদের মাতা বলা হয়েছে এবং তাকে সপ্তনদীর সপ্তম নদী বলা হয়েছে। সিন্ধুকে রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় মাতা বলেছেন। এখানে তিনি 'সিন্ধুমাতা' পদটিকে সরস্বতীর বিশেষণবোধকরূপে ব্যবহার করেননি। অতএব তিনি সিন্ধুকে সপ্তনদীর মধ্যে অন্যতম বলে গ্রহণ করেছেন এবং সরস্বতীকে সপ্তমস্থানীয় বলেছেন। এবং তিনি এরকম অনুবাদ করেছেন — "যে নদীগণের মধ্যে সিন্ধুমাতা ও সরস্বতী সপ্তমস্থানীয়া, সেই কামদুঘা সুধারা নদীগণ প্রবাহিত হইতেছে।" এই অনুবাদের ব্যাখ্যা প্রস্তুত করে পাদটীকায় বলেছেন, "ইহার পূর্বে অনেক স্থানে সপ্তনদীর উল্লেখ পাইয়াছি। ঋগ্বেদে কোন্ সাতটি নদীকে সপ্তনদী বলিয়া উল্লেখ করিত তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর, এখানে সিন্ধুকে তাহাদিগের মাতা ও সরস্বতীকে সপ্তমস্থানীয়া বলা হইয়াছে। অতএব বোধ হয় সিন্ধু ও তাহার পঞ্চশাখা ও সরস্বতী এই সাতটিকে সপ্তনদী বলিত।" এখানে বক্তব্য এই যে, একই মন্ত্রের 'সিন্ধুমাতা' এই পদের সায়ণাচার্য এরকম অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন। আবার রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় আর একরকম অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন। সায়ণাচার্যের পারম্পরিক ব্যাখ্যা অতিক্রম করে তিনি যে ব্যাখ্যা প্রদর্শন করলেন, তা কি গ্রাহ্য হতে পারে? এমনকি কোনো নিয়ম আছে যে, সায়ণাচার্য যে ব্যাখ্যা করেছেন, তার বাইরে আর ব্যাখ্যা হতে পারে না? এক শব্দের নানা অর্থ কি দেখা যায় না? এই দুই ব্যাখ্যাই ব্যাকরণের হাত ধরে হতে পারে। সায়ণাচার্য 'সিন্ধূনাং মাতা' এই রকম বিগ্রহে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসে 'সিন্ধুমাতা' পদটিকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কৃত ব্যাখ্যা পেতে গেলে রূপক কর্মধারয় সমাসে (পাণিনিমতে ময়ূরব্যংসকাদিবৎ সমাসে) বা উপমিত কর্মধারয় সমাসে পদটির নিষ্পত্তি চিন্তা করতে হবে। যেমন 'পুরুষব্যাঘ্রঃ গচ্ছতি' ইত্যাদিস্থলে 'পুরুষ এব ব্যাঘ্রঃ' বা 'পুরুষঃ ব্যাঘ্র ইব' এরকম ভাবে 'পুরুষব্যাঘ্রঃ' পদটির নিষ্পত্তি হয় এবং সেখানে পুরুষেরই গমন বোধিত হয়। একইরকমভাবে 'সিন্ধুঃ এব মাতা' বা 'সিন্ধুঃ মাতা ইব' এরকম বিগ্রহে যথাক্রমে রূপক কর্মধারয় (ময়ূরব্যংসকাদিবৎ নিত্য সমাসে) বা উপমিত কর্মধারয় সমাসে 'সিন্ধুমাতা' এই পদটি নিষ্পন্ন হয়। সুতরাং দুই ব্যাখ্যাই ব্যাকরণতঃ গ্রাহ্য হয়।

কিন্তু প্রশ্ন হয় লৌকিক সংস্কৃতে কেবল ব্যাকরণের দিক থেকে শুদ্ধি বিচার করলেই হল। বৈদিক সংস্কৃতে শুধু ব্যাকরণ নয়, স্বরশুদ্ধিও লক্ষ্য করতে হয়। 'সিন্ধুমাতা' পদটি তৎপুরুষ সমাসেই নিষ্পন্ন হোক বা কর্মধারয় সমাসেই নিষ্পন্ন হোক, "সমাসস্য" সূত্রে অন্তোদাত্ত হলেও "কুরুগার্হপতরিক্ত—"(৬.২.৪২.) ইত্যাদি সূত্রে পূর্বপদপ্রকৃতিস্বরত্ব পদটির বিহিত হয়। যদিও 'সিন্ধুমাতা' পদটি এই পদগুলির মধ্যে সাক্ষাৎ উল্লিখিত হয়নি, তবুও "যস্য তৎপুরুষস্য পূর্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বমিষ্যতে, ন বিশিষ্য বচনং বিহিতং, স সর্বোপি দাসীভারাদিষু দ্রষ্টব্যঃ" এই দীক্ষিতের বচন অনুসারে প্রকৃত পদটিরও পূর্বপদপ্রকৃতিস্বরত্ব স্থাপিত হয়। এখন 'সিন্ধুমাতা' পদটির পূর্বপদ 'সিন্ধু' পদটির আদিস্বর ইকার "হ্রস্বান্তস্য স্ত্রীবিষয়স্য" (ফিট্ সূত্র ২৫) এই সূত্রে উদাত্ত হয়। সেই দিক থেকে দেখলে সায়ণাচার্যকৃত অর্থনির্ণয় সাধু বলে গৃহীত হতে পারে, রমেশচন্দ্র কৃত ব্যাখ্যা নয়। কেননা, সায়ণাচার্য 'সিন্ধুমাতা' পদের ঘটকীভূত পূর্ববর্তী 'সিন্ধু' পদটিকে নদী অর্থে গ্রহণ করেছেন, যা একটি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ।

প্রশ্ন হল, রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় 'সিন্ধু' শব্দটির কীরকম অর্থ গ্রহণ করেছেন — নদ নাকি নদী? যদি 'সিন্ধু' শব্দের দ্বারা নদ বোধিত হয়, তাহলে 'সিন্ধুমাতা' পদটি আদ্যুদাত্ত হয় না। কেননা, "হ্রস্বান্তস্য স্ত্রীবিষয়স্য" সূত্রটিতে হ্রস্বান্ত সেই প্রাতিপদিকের আদিস্বর উদাত্ত বলে বিহিত হয়েছে, যে শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গক। আর 'বাচস্পত্যম্' কোষে বলা হয়েছে, সিন্ধুপদটি নদ অর্থে পুংলিঙ্গ। নদীসামান্য ও নদীবিশেষ (বিপাশাযুক্ত শতদ্রু) অর্থে স্ত্রীলিঙ্গ। আর যদি দ্বিতীয় পক্ষ গৃহীত হয়, তাহলে সিন্ধুকে মাতা বলা যায় না। কেননা, ভৌগোলিক দিক থেকে ইরাবতী, শতদ্রু, বিতস্তা, বিপাশা ও চন্দ্রভাগা — এই পাঁচটি সিন্ধু নদের শাখা, কিন্তু সিন্ধু নদীর নয়। ইতিহাসবিদ্-গণও একথা বলেছেন, সপ্তসিন্ধু হল পাঞ্জাবের পাঁচটি নদী (শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা এবং বিতস্তা) এবং সিন্ধু নদ ও সরস্বতী। সুতরাং সায়ণাচার্যকৃত ব্যাখ্যাতেই "সিন্ধুমাতা" এই আদ্যুদাত্ত পদটি নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু রমেশ চন্দ্র দত্ত কৃত ব্যাখ্যাতে নয়। এছাড়াও রমেশচন্দ্রকৃত ব্যাখ্যাতে 'সিন্ধুমাতা' পদটি বিশেষণবোধকরূপে প্রযুক্ত হওয়ায় এর বিশেষ্যের প্রতিসন্ধান করতে হয়। "যাসাং রাজর্ষিঃ দুষ্যন্তঃ, তাঃ প্রজাঃ সুখিতাস্তিষ্ঠন্তি" — এখানে যেমন 'রাজর্ষি' বিশেষণ বাচক পদের সন্নিধানে 'দুষ্যন্তঃ' এই বিশেষ্যবাচক পদটি গৃহীত হয়েছে, তেমনই "যে নদীগণের মধ্যে সিন্ধুমাতা ও সরস্বতী সপ্তমস্থানীয়া, সেই কামদুঘা সুধারা নদীগণ প্রবাহিত হইতেছে" — এই অনুবাদে 'সিন্ধুমাতা' এই বিশেষণবাচক পদের উত্তর বিশেষ্যবাচক পদের যোজনা করা উচিত। ফলতঃ এখানে অর্থের আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্তি ঘটে না। তাঁর ব্যাখ্যা অনুযায়ী সিন্ধুই বিশেষ্যরূপে অধ্যাহৃত হওয়া উচিত। সেক্ষেত্রে "সিন্ধুমাতা সিন্ধুঃ" এরকম বাক্য হবে। সেক্ষেত্রেও অর্থবোধে গ্লানি হয়। আরও কথা এই যে,

"গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।/নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেস্মিন্ সন্নিধিং কুরু"।।

এই গঙ্গাদি সপ্তবিধ নদীবিষয়ক স্মৃতি নির্মূল হতে পারে না। নিশ্চয় এর মূলে শ্রুতি বর্তমান। সেদিক থেকে বিচার করলেও সিন্ধু সপ্ত নদীর বিশেষ এক নদী হতে পারে মাত্র, তাকে মাতা বলা যায় না। সায়ণাচার্যের ব্যাখ্যা অনুসারে "সিন্ধুমাতা" শব্দটি সরস্বতীর বিশেষণবোধক হওয়ায় সরস্বতীকে কীভাবে মাতা বলা যায়? এর উত্তরে বলা যায় যে, সরস্বতীকে শ্রেষ্ঠ অর্থে মাতৃভূত বলা হয়েছে। সরস্বতীকে নদীতমা বলা হয়েছে ঋগ্বেদে। অন্যত্রও কথিত হয়েছে যে, "প্রস্নুতাসি মহাভাগে সরসো ব্রহ্মণঃ পুরা। জানন্তি ত্বাং সরিচ্ছ্রেষ্ঠে মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ"।। (ভা. শ. ৫ অ)

আমাদের চিন্তায় অন্যত্র সর্বত্র সায়ণাচার্যের প্রদর্শিত ব্যাখ্যাকে অনুসরণ করে অনুবাদ করলেও এখানে রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় ঐ পথ অতিক্রম করে ব্যাখ্যান্তর প্রদর্শন করলেন কেন? আমাদের চিন্তায় এটুকু ধরা পড়ে যে, ঋগ্বেদের অন্যত্র সপ্তনদীর কথা আছে। ঋগ্বেদের অনুবাদ করতে বসে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় সংস্কৃত ব্যাকরণ, স্বর ইত্যাদির উপর প্রতিপদে ততটা দৃষ্টি দেননি, যতটা তিনি ইতিহাসের উপর দৃষ্টি দিয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্যও ছিল একটু ভিন্ন, যে কারণে ব্যাকরণাদির উপর তাঁর দৃষ্টি শিথিল হয়েছে।

চতুর্থতঃ, এখানে একটি বিশেষ বক্তব্য যে, সায়ণাচার্য ঋগ্বেদের ষষ্ঠ অষ্টকের চতুর্থ অধ্যায়ের ৪৯ নং সূক্ত হতে ৫৯ নং সূক্ত পর্যন্ত ১১ টি সূক্ত, যা বালখিল্য সূক্ত বলে পরিচিত, তার কোনো টীকা রচনা করেননি। কিন্তু সেই সকল সূক্তের মন্ত্রের অনুবাদ রমেশচন্দ্র দত্ত প্রকাশ করেছেন।

পঞ্চমতঃ কোনো কোনো জায়গায় আবার মন্ত্রের অর্থ স্পষ্ট নয় বলে নিজেই অকপট স্বীকারোক্তি করেছেন। যেমন এই ষষ্ঠ অষ্টকের চতুর্থ অধ্যায়ের ৭ নং বালখিল্য সূক্তের তৃতীয় মন্ত্রটির শব্দের অর্থ একেবারে অজানা বলে বলেছেন —

"মূলে ঋক্ এই "শতং বেণূন্ শতং শুনঃ শতং চর্মাণি ম্লাতানি।/শতং মে বল্বজস্তকাঃ অরুষীণাং চতুঃশতম্"।। এসকল শব্দের অর্থ বুঝিতে পারি নাই ।" উক্ত মন্ত্রের এরূপ অনুবাদ করেছেন —

"শতবেণু, শতশ্বা, শতম্লাত চর্ম্ম, শতবল্বজস্তুক এবং চারিশত অরুষী রহিয়াছে।" (৬ অষ্টক ৪ অধ্যায় ৭ বালখিল্য সূক্ত ৩ মন্ত্র)

এখানে মন্ত্র ও তার অনুবাদের শব্দগুলি দেখলে স্পষ্টতঃ বোঝা যায় যে, মন্ত্রের শব্দগুলিকেই প্রায় অনুবাদে রেখে দিয়েছেন। এবং নিজেও পাদটীকায় স্বীকারোক্তি করেছেন যে, 'এসকল শব্দের অর্থ বুঝিতে পারি নাই'।

আমাদের মনে হয়, কতকগুলি শব্দের অর্থ আমাদের সকলের পরিচিত —যেমন

বেণু, শ্বন্, চর্ম ইত্যাদি। কিন্তু বল্বজস্তক ও অরুষী শব্দের অর্থ প্রায় অপরিচিত। সায়ণাচার্য এই বালখিল্য সূক্তের অন্তর্গত মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা করেননি। কিন্তু অজ্ঞাতকর্তৃক এক ভাষ্যে বারাণসীর রাজকীয় সংস্কৃত পাঠশালাতে 'বল্বজস্তক' বলতে 'তৃণপূল'কে বোঝানো হয়েছে। এই 'তৃণপূল' বলতে কী বোঝায়? তৃণ শব্দের অর্থ ঘাস। আর পুল বলতে সমষ্টি বা রাশীকরণকে বোঝায়। তাই শব্দকল্পদ্রুমে বলা হয়েছে — "সংহতৌ ইতি কবিকল্পদ্রুমঃ। ...সংহতৌ রাশীকরণম্ ইতি দুর্গাদাসঃ"। অতএব 'তৃণপূল' পদটির অর্থ "তৃণানাং পূলঃ তৃণপূলঃ" অর্থাৎ তৃণসমষ্টি। এবং "ন রোষতি ক্রুধ্যতি" এই অর্থে নঞপূর্বক ক্রোধার্থক রুষ্ ধাতুর উত্তরে কপ্রত্যয়ে 'অরুষ' শব্দটির নিষ্পত্তি হয়। এর অর্থ হয়, ক্রোধরহিত। কিন্তু গমনার্থক ঋধাতুর উত্তর 'উষন্' প্রত্যয়েও 'অরুষ' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। তার অর্থ গমনশীল বা রোচমান। এখানে রোচমানা (দীপ্তিমতী) অর্থে শব্দটির প্রয়োগ হয়েছে। এই পদটি বিশেষণবোধক। বিশেষ্যরূপে গো পদার্থের অধ্যাহার হয়। আবার ম্লাত পদের অর্থ কী? ভাষ্যে অর্থ করা হয়েছে — মৃদুকৃত অর্থাৎ শিথিলীকৃত (নরম) অর্থাৎ যাকে শিথিল করা হয়েছে এমন। অতএব মন্ত্রটির অনুবাদ হয় এমন – শতসংখ্যক (অর্থাৎ অপরিমিত) বেণু, শতসংখ্যক (অর্থাৎ অপরিমিত) সারমেয়, শতসংখ্যক (বহু) ম্লাত চর্ম অর্থাৎ শিথিলীকৃত চামড়া (অজিন), শতসংখ্যক (অর্থাৎ অপরিমিত) বল্বজস্তক (অর্থাৎ তৃণসমূহ) এবং অরুষী (অর্থাৎ রোচনশীল) গাভীদের চতুঃশত (আমাকে অর্থাৎ কৃশনামক ঋষিকে) দিয়েছেন।।

মন্ত্রে কোনো ক্রিয়াপদের উল্লেখ নেই। সুতরাং কোনো ক্রিয়াপদের অধ্যাহার করা বাঞ্ছনীয়। তবে যো ক্রিয়াপদেরই অধ্যাহার করা উচিত। পূর্ব বা পরবর্তী মন্ত্র থেকে কোনো ক্রিয়াপদের অনুবৃত্তি করা সমীচীন হবে না। কেননা, পূর্বের "রোচন্তে" বা পরের "চঙ্-ক্রমন্তে" ইত্যাদি ক্রিয়ার সঙ্গে অন্বয়ের যোগ্যতা নেই। রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তা করেনও নি। তবে তিনি "রহিয়াছে"— এই অস্ত্যর্থক ক্রিয়াপদের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তা কোনো প্রকারেই সঙ্গত হয় না। কেননা, উক্ত রহিয়াছে অস্ত্যর্থক ক্রিয়া অকর্মক হওয়ায় তার কর্ম থাকতেই পারে না। তাহলে মন্ত্রে 'বেণূন্' ইত্যাদি স্থলে কীভাবে কর্মে দ্বিতীয়ার উপপত্তি হয়? আমাদের মনে হয়, এখানে কোনো সকর্মক ক্রিয়ারই অধ্যাহার কর্তব্য। আর প্রকরণ বিচারে তা দান ক্রিয়াই হতে পারে। কেননা, এই সূক্তের অন্তর্গত মন্ত্রগুলিতে প্রস্কণ্ব দেবতার দানস্তুতি করা হচ্ছে। তাই সর্বানুক্রমণিকাতে বলা হয়েছে — "ভূরীৎ পঞ্চ কৃশঃ প্রস্কণ্বস্য দানস্তুতির্গায়ত্রস্তু তৃতীয়ান্ত্যে অনুষ্টুভৌ"। সুতরাং 'প্রাদাৎ' ক্রিয়ার অধ্যাহারই সঙ্গত বলে প্রতীত হয়, যা আমরা পূর্বে প্রদর্শন করেছি। এ সমস্ত থেকে মনে হয়, রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় একটু সংস্কৃতকোষগ্রন্থ ও সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রতি শিথিলদৃষ্টি হয়েছিলেন। অন্যথা এই স্থলগুলিরও অনুবাদে তিনি সাবলীল হতেন। বস্তুতঃ সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদে

ব্যাকরণ ও কোষগ্রন্থগুলি এক উপেক্ষানর্হ নান্তরীয়ক পাথেয়।§

রমেশ চন্দ্র দত্ত তাঁর পিতার বন্ধু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট হতে সাহিত্য রচনার জন্য উৎসাহ লাভ করেন। চারটি উপন্যাস রচনা করেন। তিনি প্রথম ভারতীয় যাঁর দ্বারা বাংলায় অনূদিত ঋগ্বেদ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই সময়ে তাঁর দুটি সামাজিক উপন্যাসও প্রকাশ লাভ করে। 'সমাজ' উপন্যাসে (১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে) তৎকালীন হিন্দু সমাজের বিধবা বিবাহ সম্পর্কে ও 'সংসার' নামক উপন্যাসে (১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে) বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের পক্ষে তিনি মত প্রকাশ করেন। আরও একটু পরে ইংরাজী ভাষায় 'রামায়ণ' (১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে) ও 'মহাভারতের' (১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে) অনুবাদ করেন। এক সময়ের কৃতী ছাত্র, এই উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী জীবনের রঙ্গমঞ্চে কখনও রাজনীতিক, কখনও অর্থনৈতিক চিন্তাবিদ্, নানা কৃতিত্বের অধিকারী সংস্কৃতজ্ঞ এই ব্যক্তির এই সময়ের এই সামাজিক উপন্যাস ও অনুবাদ সাহিত্য রচনাগুলির মধ্যে এক যোগসূত্র কল্পনা করতে পারি। নিয়ম হল "সমানরূপাঃ সহচরা ভবন্তি"। অর্থাৎ তারাই সহচরিত হয়, যারা সমানরূপবিশিষ্ট হয়। ঐ সময়ে এক ঐতিহাসিকের পর পর সমাজকে ঘিরে রচিত উপন্যাস, অনুবাদ সাহিত্য মনে করায় সমাজ সংস্কারের কথা। হিন্দুসম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ ঋগ্বেদের প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু যাতে করে সংস্কৃতভাষাজ্ঞানহীন আপামর সাধারণ সমাজচেতনাতে পৌঁছতে পারে, তার জন্য দরকার ছিল ঋগ্বেদের ভাষাতে অনুবাদ হওয়া। সেই সমাজে যে এর দরকার ছিল, সমাজের সংস্কারের যে দরকার ছিল, তার সাক্ষ্য বহন করে এক অব্রাহ্মণের হাতে ঋগ্বেদের অনুবাদকে ঘিরে ঘনীভূত হওয়া সেকালের বিতর্কই।

"Orthodoxy took alarm at the prospect of the sacred hymns being laid open to laymen: and the idea of a non-Brahman like Mr. Dutt laying sacrilegious hands on the holiest of holy books raised a perfect storm of opposition. Bengal had seldom witnessed such a violent literary controversy since the days when the venerable Vidyasagar had stood up for the

---

§ রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদ ছাড়া আর একটি উল্লেখযোগ্য অনুবাদকর্ম ১৩২২ সালে কাশীধামে বেদোদ্বোধিনী সমিতি প্রতিষ্ঠিত বেদপ্রকাশ কার্যালয় থেকে লোকনাথশর্ম্ম শিরোমণি, ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাশ্রমী, অনন্তদেবশর্ম্ম তর্করত্ন ও বিশ্বেশ্বরশর্ম্ম বিদ্যারত্ন কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থ এখন সহজলভ্য নয়। 'ঋগ্বেদ সংহিতা' প্রথম খণ্ড প্রকাশের সময় এ গ্রন্থের প্রস্তাবনার শেষে জানানো হয় —
'ভূদেব-ধর্ম্মোদিত"সোমদেব- /সৎকর্ম্মভাণ্ডার"-সহায়তাং তাম্ /প্রাপ্যৈব বেদস্য সুমুদ্রিতং সৎ /প্রাপ্তপ্রকাশং প্রথমং হি খণ্ডম্।।' **[এই পাদটীকা অংশের সংযোজন দশদিশি সম্পাদকীয় দপ্তরের পক্ষ থেকে]**

Marriage of Hindu widows and the abolition of Polygamy". (Romesh Chunder Dutt— A Sketch of His Life and Career, Page No. 12)

সেই সংস্কারকার্যে রমেশ চন্দ্র দত্তের প্রথম বাঙালীর মাতৃভাষায় অনুবাদ নিশ্চয় একটা জায়গা করে নিয়েছিল একথা বলতে হবে। তাই রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য মহাশয় বলছেন,

"Rammohun's successors like Romesh Chandra Dutt continued his works by translating the Vedas and Upanisads into both Bangla and English. Translation thus became an intrinsic part of nationalist response seeking to represent the past in favorable light and at the same time trying to bring about social, intellectual and moral reforms along with it." *(Rammohun Roy as a Translator of the Upanishads, page 6)*

উপনিষদ্

পূর্বেই বলা হয়েছে উপনিষদ্ বেদেরই অংশবিশেষ। একে "বেদান্ত" শব্দের দ্বারাও অভিহিত করা হয়। "বেদান্ত" বলতে অবশ্য প্রস্থানত্রয়ীকে বোঝায়। শ্রুতিপ্রস্থান, স্মৃতিপ্রস্থান ও ন্যায়প্রস্থান। তার মধ্যে উপনিষদই বস্তুতঃ পক্ষে শ্রুতিপ্রস্থান। তাই বেদান্তসারে সদানন্দযোগীন্দ্রমহাশয় বলেছেন — "বেদান্তো নামোপনিষৎপ্রমাণং তদুপকারীণি শারীরকসূত্রাদীনি চ" ইতি।

চতুর্বিধ সংহিতার ব্যাখ্যানরূপে "ব্রাহ্মণ" অংশ বিদ্যমান। প্রত্যেক ব্রাহ্মণের সঙ্গে "আরণ্যক" সম্বদ্ধ। আরণ্যকের সঙ্গে উপনিষদ্ ভাগ আবার সম্বদ্ধ। ফলতঃ প্রত্যেক বেদেরই উপনিষদ্ পাওয়া যায়। ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব — চার বেদেই ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ ভাগ আছে। যজুর্বেদের আবার দুটি ভাগ। বেদব্যাসের নির্দেশে তাঁর শিষ্য বৈশম্পায়ন যে যজুর্বেদ সংকলন করেন তার প্রসিদ্ধি কৃষ্ণযজুর্বেদ ও তৈত্তরীয় সংহিতা নামে। বৈশম্পায়নের শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য গুরুর সঙ্গে বিবাদ করে অন্য যজুর্বেদ সংকলন করেন। সেই যজুর্বেদ শুক্লযজুর্বেদ ও বাজনেয় সংহিতা নামে প্রসিদ্ধ। এই চারটি বেদ এবং তাদের অন্তর্গত উপনিষদ্গুলি — ১। ঋগ্বেদ — ঐতরেয় ও কৌষীতকি; ২। সামবেদ — ছান্দোগ্য ও কেন; ৩। (ক) কৃষ্ণযজুর্বেদ — তৈত্তিরীয়, কঠ ও শ্বেতাশ্বতর; (খ) শুক্লযজুর্বেদ — বৃহদারণ্যক ও ঈশ; ৪। অথর্ববেদ — প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য। এছাড়াও পরবর্তীকালে অনেক অপ্রধান উপনিষদ্ রচিত হয়েছে।[§]

---

§ **[এই পাদটীকা অংশের সংযোজন দশদিশি সম্পাদকীয় দপ্তরের পক্ষ থেকে] :** রচনার প্রাচীনত্ব ও রীতি অনুসারে উপনিষদ্গুলির চারটি শ্রেণীবিভাগ করা হয়। বুদ্ধের আগে ও পরে কোন্ কোন্ উপনিষদের সৃষ্টি সে বিষয়টিও এক্ষেত্রে আগ্রহের উদ্রেক করে। কারণ, বলা হয় বুদ্ধের ধর্মচিন্তা উপনিষদ্ দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত ছিল। A. B. Keith

উপনিষদের মূল কথা

উপনিষদের মূল বিষয় কী এ বিষয়টি অনুধাবন করতে পারা যায় ঐ শব্দটির ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ থেকেই। উপপূর্বক সদ্ ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয়ে উপনিষদ্ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। উপ শব্দের অর্থ সামীপ্য। নিশব্দের অর্থ নিশ্চয়ভাবে বা নিঃশেষে।

-এর ভাষায় : "..... in the Dhammapada of the Pāli canon we have the finest collection of sententiae known in India." (A History of Sanskrit Literature by A. Berriedale Keith, Oxford at the Clarendon Press, 1928) অর্থাৎ পালি ভাষায় রচিত বুদ্ধের 'ধম্মপদ' নীতিমালায় তদানীন্তন ভারতবর্ষের বহু চর্চিত ও প্রচলিত বেশ কিছু সূত্র সংগৃহীত হয়েছে। এক্ষেত্রে বেদের কিছু কিছু সূক্ত যা উপনিষদের অন্তর্গত তাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। Keith আরও মন্তব্য করেছেন, সূক্তগুলির মূল রচনাংশ হুবহু তুলে ধরা হয়নি। বুদ্ধের দর্শন ও দৃষ্টিকোণের নিরিখে এক নতুন ভাষ্য বুদ্ধের বাণীর বিষয়বস্তু রূপে প্রকাশ পেয়েছে। উপনিষদের বাণীর সঙ্গে বুদ্ধের ধর্মচিন্তার কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকার কারণে বুদ্ধপূর্ব উপনিষদ্গুলিকে প্রাচীনত্ব ও রচনার প্রকৃতি অনুযায়ী প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ঐতরেয়, কৌষীতকি, তৈত্তিরীয়, বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, কেন —এই ছটি উপনিষদ্ বুদ্ধপূর্ব যুগের। এগুলি প্রধানত গদ্যের ভাষায় রচিত। এগুলিকে প্রথম শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। এদের রচনার ধরন বেদের ব্রাহ্মণ ভাগের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। কঠ, শ্বেতাশ্বতর, তৈত্তিরীয় উপনিষদের আরণ্যক ভাগের চতুর্থ প্রপাঠক (অধ্যায়) — 'মহানারায়ণ', ঈশা ও মুণ্ডক —এই পাঁচটি পদ্যে রচিত। প্রথম শ্রেণীভুক্ত উপনিষদগুলির কিছুকাল পরে এগুলি রচিত। এগুলিও বুদ্ধপূর্ব যুগের। এগুলি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। উপনিষদ সাহিত্যে এই উপন্যাসগুলি বিশেষভাবে আদৃত। বলা হয় বেদান্তর সঙ্গে সাংখ্যযোগের মত মিশ্রিত হয়েছে এই উপনিষদগুলিতে। A. B. Keith এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "The issue eventually turns on the interpretation to be given to the fact that a number of Upaniṣads, in special the Kaṭha, present features which may either be regarded as a preliminary stage in the development to the Sāṁkhya or as the influence of an already existing Sāṁkhya on the Upaniṣads." (A History of Sanskrit Literature) তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর উপনিষদ্গুলি বুদ্ধ-পরবর্তী যুগের রচনা। প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। গদ্য ও পদ্য দুটি রীতিই এখানে পাওয়া যায়। এদের ভাষাও তুলনায় সহজ — লৌকিক সংস্কৃত ভাষার অনুসারী। চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্গত উপনিষদ্ সংখ্যায় বহু। বিভিন্ন সম্প্রদায় নিজের নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে উপনিষদ্ নামে যে রচনাগুলিকে চালু করার চেষ্টা করেছে এই শ্রেণীতে সেগুলিকে ধরা হয়। প্রায়শ বেদের সঙ্গে এদের তেমন কোনো যোগ নেই। ব্রহ্মতত্ত্বও অনেক সময় এদের প্রতিপাদ্য নয়, বরং এরা পুরাণ ও তন্ত্র অনুসারী। শাক্ত, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপনিষদ্, যোগ, সন্ন্যাস ইত্যাদি বিষয়ে উপনিষদ্, এমনকি মোগল যুগে 'আল্লোপনিষদ্' নামেও রচনা পাওয়া গেছে।

সদ্ ধাতুর তিনটি অর্থ বিদ্যমান – বিশরণ, গতি ও অবসাদন। তিন অর্থে উপনিষদ্ শব্দের তিন ধরনের ব্যুৎপত্তি যথাক্রমে — উপ (উপগম্য) নি (নিশ্চয়েন) সদ্ (সীদতি, গময়তি প্রাপয়তি বা) (ব্রহ্মতত্ত্বং) যা বিদ্যা সা উপনিষদ্। অর্থাৎ গুরুর নিকট উপস্থিত হলে নিশ্চিতভাবে যে বিদ্যা ব্রহ্মতত্ত্ব প্রাপ্ত করায়, তাকে উপনিষদ্ বলে। অথবা উপ (সত্বরং) নি (নিশ্চয়েন) সদ্ (গর্ভজন্মজরারোগশোকাদ্যনর্থপুগম

মুক্তিকোপনিষদের (যজুর্বেদের অন্তর্গত) প্রথম অধ্যায়ে আছে, রামচন্দ্র হনুমানকে সর্বমোট ১০৮টি উপনিষদের নাম বলেন যার মধ্যে ছিল ঋগ্বেদের ১০টি, সামবেদের ১৬টি, কৃষ্ণযজুর্বেদের ৩২টি, শুক্লযজুর্বেদের ১৯টি, এবং অথর্ববেদের ৩১টি উপনিষদ্। নির্ণয়সাগর প্রেস, বোম্বাই ১৯৪৮ সালে 'ঈশাদিবিংশোত্তরশতোপনিষদঃ" নামে ১২০টি উপনিষদের সংকলন প্রকাশ করে। সেই ১২০টি উপনিষদের নাম —১। ঈশাবাস্য ২। কেন ৩। কঠ ৪। প্রশ্ন ৫। মুণ্ডক ৬। মাণ্ডুক্য ৭। তৈত্তিরীয় ৮। ঐতরেয় ৯। ছান্দোগ্য ১০। বৃহদারণ্যক ১১। শ্বেতাশ্বতর ১২। কৌষীতকি-ব্রাহ্মণ ১৩। মৈত্রেয়ী ১৪। কৈবল্য ১৫। জাবাল ১৬। ব্রহ্মবিন্দু ১৭। হংস ১৮। আরুণিক ১৯। গর্ভ ২০। নারায়ণাথর্বশিরস্ ২১। মহানারায়ণ ২২। পরমহংস ২৩। ব্রহ্ম ২৪। অমৃতনাদ ২৫। অথর্বশিরস্ ২৬। অথর্বশিখা ২৭। মৈত্রায়ণী ২৮। বৃহজ্জাবাল ২৯। নৃসিংহপূর্বতাপনীয় ৩০। নৃশিংহোত্তরতাপনীয় ৩১। কালাগ্নিরুদ্র ৩২। সুবাল ৩৩। ক্ষুরিকা ৩৪। মন্ত্রিকা ৩৫। সর্বসার ৩৬। নিরালম্ব ৩৭। শুকরহস্য ৩৮। বজ্রসূচিকা ৩৯। তেজোবিন্দু ৪০। নাদবিন্দু ৪১। ধ্যানবিন্দু ৪২। ব্রহ্মবিদ্যা ৪৩। যোগতত্ত্ব ৪৪। আত্মপ্রবোধ ৪৫। নারদপরিব্রাজক ৪৬। ত্রিশিখিব্রাহ্মণ ৪৭। সীতা ৪৮। যোগচূড়ামণি ৪৯। নির্বাণ ৫০। মণ্ডলব্রাহ্মণ ৫১। দক্ষিণামূর্তি ৫২। শরভ ৫৩। স্কন্দ ৫৪। ত্রিপাদ্বিভূতিমহানারায়ণ ৫৫। অদ্বয়তারক ৫৬। রামরহস্য ৫৭। শ্রীরামপূর্বতাপিনী ৫৮। শ্রীরামোত্তরতাপিনী ৫৯। বাসুদেব ৬০। মুদ্গল ৬১। শাণ্ডিল্য ৬২। পৈঙ্গল ৬৩। ভিক্ষুক ৬৪। মহা ৬৫। শারীরক ৬৬। যোগশিখা ৬৭। তুরীয়াতীতা ৬৮। সন্ন্যাস ৬৯। পরমহংসপরিব্রাজক ৭০। অক্ষমালিকা ৭১। অব্যক্ত ৭২। একাক্ষর ৭৩। অন্নপূর্ণা ৭৪। সূর্য ৭৫। অক্ষি ৭৬। অধ্যাত্ম ৭৭। কুণ্ডিক ৭৮। সাবিত্রী ৭৯। আত্মা ৮০। পাশুপতব্রহ্ম ৮১। পরব্রহ্ম ৮২। অবধূত ৮৩। ত্রিপুরাতাপিনী ৮৪। দেবী ৮৫। ত্রিপুরা ৮৬। কঠরুদ্র ৮৭। ভাবনা ৮৮। রুদ্রহৃদয় ৮৯। যোগকুণ্ডলী ৯০। ভস্মজাবাল ৯১। রুদ্রাক্ষজাবাল ৯২। গণপতি ৯৩। শ্রীজাবালদর্শন ৯৪। তারসার ৯৫। মহাবাক্য ৯৬। পঞ্চব্রহ্ম ৯৭। প্রাণাগ্নিহোত্র ৯৮। গোপালপূর্বতাপিনী ৯৯। গোপালোত্তরতাপিনী ১০০। কৃষ্ণ ১০১। যাজ্ঞবল্ক্য ১০২। বরাহ ১০৩। শাট্যায়ানীয় ১০৪। হয়গ্রীব ১০৫। দত্তাত্রেয় ১০৬। গারুড় ১০৭। কলিসন্তরণ ১০৮। জাবালি ১০৯। সৌভাগ্যলক্ষ্মী ১১০। সরস্বতীরহস্য ১১১। বহ্বৃচ ১১২। গণেশপূর্বতাপিনী ১১৩। গণেশোত্তরতাপিনী ১১৪। গোপীচন্দন ১১৫। পিণ্ড ১১৬। মহা ১১৭। আশ্রম ১১৮। সন্ন্যাস ১১৯। যোগশিখা ১২০। মুক্তিক।

বিদ্যাসংসারকারণঞ্চ সীদতি অবসাদয়তি শিথিলীকরোতি বা) ইতি উপনিষদ্। অর্থাৎ যে বিদ্যা নিশ্চয়ে গর্ভজন্মাদিদুঃখ ও অবিদ্যা রূপ সংসারকারণকে শিথিল করে তাকে উপনিষদ্ বলে অথবা যে বিদ্যা নিঃশেষে মায়া ও তার কার্যকে নাশ করে, তাকে উপনিষদ্ বলে। অর্থাৎ আত্মবিদ্যাই হল উপনিষদ্। তাই বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যে শঙ্করাচার্য বলেছেন, "সদের্ধাতোর্বিশরণগত্যবসাদনার্থস্য উপনিপূর্বস্য ক্বিপ্প্রত্যয়ান্তস্য রূপমিদমুপনিষদিতি। উপনিষচ্ছব্দেন চ ব্যাচিখ্যাসিতগ্রন্থপ্রতিপাদ্যবেদ্যবস্তুবিষয়া বিদ্যোচ্যতে... পূর্বোক্তবিশেষণবিশিষ্টান্ মুমুক্ষুন্ বা পরং ব্রহ্ম গময়তীতি ব্রহ্মগময়িতৃত্বেন যোগাদ্ ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষৎ।"

"বেদান্ত" শব্দের তাৎপর্য হতেও উপনিষদের মূল বক্তব্য বোঝা যায়। "বেদস্য অন্তঃ" এই বিগ্রহে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে বেদান্ত শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। "অন্ত" শব্দের অর্থ শেষ নয়। তাহলে বেদের অন্তিম ভাগকেই বেদান্ত বলতে হতো। সেক্ষেত্রে ঈশোপনিষদে অব্যাপ্তি হতো। কেননা ঈশোপনিষদ্ সংহিতাভাগের অংশ। তা বেদের অন্তিম ভাগে সম্বদ্ধ নয়। অন্ত শব্দটির অর্থ নিশ্চয় বা সার। বেদের যা নিশ্চয় বা সার তাই হল বেদান্ত। "অন্ত" শব্দের অর্থ নিশ্চয় এপক্ষে প্রমাণ কী? বাচস্পত্যম্ কোষে অন্ত শব্দের অর্থ নিশ্চয়ও করা হয়েছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় "উভয়োরপি দৃষ্টোন্তস্ত্বনয়োস্ তত্ত্বদর্শিভিঃ" এই শ্লোকে 'অন্ত' শব্দের অর্থ নিশ্চয় করা হয়েছে।

আশয় এই যে, যদি বেদসমূহকে দুগ্ধ বলা যায়, তাহলে উপনিষদকে বলা যায় নবনীত। যদি বলা হয়, উপনিষদে কোথাও নচিকেতা-উপাখ্যান রয়েছে, কোথাও জাবালি-শ্বেতকেতুর সংবাদ, কোথাও আবার যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ীর কথা বলা হয়েছে, সেগুলিও উপনিষদের প্রতিপাদ্যবিষয় নয় কি? নানান কথা থাকে বটে সত্য কিন্তু উপনিষদের মূল সুর হল 'আত্মতত্ত্ব'। কোনো ব্যক্তির উচ্চারিত শব্দের অর্থ এক। আর তার তাৎপর্য আর এক। রাধার নীল আকাশের, কালো মেঘের আর নীলকণ্ঠ ময়ূরের দিকে তাকিয়ে থাকা সাধারণ মানুষের কাছে সত্য। কিন্তু কবিদের কাছে সত্য তাঁর কৃষ্ণতনু শ্রীকৃষ্ণের ভাবে বিভোর হয়ে থাকা। আমরা বাচ্য অর্থের গণ্ডী পার করে উপনিষদের তাৎপর্য অর্থকে তার মূল সুর বলতে চাই। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে (৪.৬) ও মুণ্ডকোপনিষদে (৩.৩.১) —

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়াঃ সমানং বৃক্ষং পরিষ্বস্বজাতে।/তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোভিচাকশীতি"।।

এই মন্ত্রের আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করে বুঝতে পারি, এখানে একটি বৃক্ষের কথা বলা হচ্ছে। সেই বৃক্ষে দুই পাখির কথা শুনতে পাওয়া যায়, এখানে সুস্বাদু পিপ্পলফল ভোজনে রত পক্ষীবিশেষের অবস্থার বর্ণনা রয়েছে – সবই সত্য। কিন্তু এর সুর বাঁধা রয়েছে আত্মতত্ত্বে। এই বৃক্ষ হল সংসার। সেই বৃক্ষ সংসারে পক্ষীরূপ দুই আত্মা — জীবাত্মা ও পরমাত্মা। সেই বৃক্ষরূপ সংসারের পিপ্পল ফল হল সুখ ও

দুঃখ, যা জীবরূপ পক্ষীটি ভোগ করে চলেছে। আর পরমেশ্বররূপ পক্ষীর সুখ ও দুঃখ ফলভোগ নেই, সে শুধু জীবের কর্মকে লক্ষ্য করে। সুতরাং নৈয়ায়িক বলেন এখানে আত্মতত্ত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে। বেদান্তী বলেন দুই পক্ষীর এক পক্ষী হল শুদ্ধচৈতন্য, সে শুদ্ধ বলে সুখ ও দুঃখ ফলভোগ করে না। সুখ দুঃখ ফলভোগকর্তৃত্ব রয়েছে অন্তঃকরণের। সে যাই হোক, অন্ততঃ শ্রুতির তাৎপর্য বাহ্য বৃক্ষ, পক্ষীতে নয়, বরং আরও দূরে আন্তর আত্মতত্ত্বে। তাই শঙ্করাচার্য কঠোপনিষদ্ভাষ্যে বলেছেন —"সেয়মাত্মবিদ্যা উপনিষচ্ছব্দবাচ্যা" অর্থাৎ সমস্ত উপনিষদের প্রতিপাদ্যই হল আত্মতত্ত্ব।

উপনিষদের বঙ্গানুবাদ

জলের মাহাত্ম্য স্থানবিশেষে কালবিশেষে বোঝা যায়। সমতলে সুলভজল স্থানে জলের প্রতি যে আকাঙ্ক্ষা, শীতকালে পীতপয়ঃ ব্যক্তির জলের প্রতি যে টান, তার চাইতে মরুভূমিতে দুর্লভজল স্থলে জলের প্রতি আকাঙ্ক্ষা, নিদাঘের মধ্যাহ্নে স্বেদসিক্ততনু ব্যাত্তানন পিপাসার্ত পথিকপুরুষের জলের প্রতি তৃষ্ণা নিশ্চয়ই মাত্রা রাখে। রাজা রামমোহন রায়ের (১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ - ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ) উপনিষদের অনুবাদের আজকের যুগে ও আজকের সমাজে যে মর্যাদা, তার চাইতে নিশ্চয়ই কয়েকগুণ বেশি মর্যাদা সেই সময়ের প্রেক্ষিতে; যে সময়ে দেশীয় সগোত্র ও বিগোত্র ধর্মপুরুষদের ভ্রুকুটিতে ও ইউরোপীয় ধর্মযাজকদের ও নিটোল বাস্তবযুক্তিবাদী বিজ্ঞানমনস্ক দার্শনিকদের নাসিকাকুঞ্চনে সনাতন ভারতীয় হিন্দুধর্ম সাঁড়াশি চাপে দমবন্ধপ্রায় ছিল; এমন মুহূর্তে তিনি উপনিষদ্-গুলির অনুবাদ করেন। এর আগে মোগল সম্রাট শাহজাহানের পুত্র ও ঔরঙ্গজেবের ভ্রাতা দারা-শিকোহ্‌র আনুকূল্যে ১৬৫৬ সালে উপনিষদের একটি পারসিক সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল যার মধ্যে ৫০টি উপনিষদ্ ছিল। পারসী অনুবাদ থেকে ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভে ল্যাটিন ভাষায় Oupnekhat নামে উপনিষদের অনুবাদ করেন ফরাসী গবেষক Anquetil Duperron কিন্তু তা পূর্ণ ও যথার্থ অনুবাদ ছিল না।§ রাজা রামমোহন রায় বাংলা

---

§ আঁকোতিল দ্যুপেরোঁর ১৮০১-০২ সালে 'ঔপ্‌নেক্‌হৎ' নামে অনুবাদ গ্রন্থ পাঠ করে জার্মান দার্শনিক আর্থার শোপেনহাওয়ার অভিভূত হয়েছিলেন। ক্রমশ উপনিষদ্ পাশ্চাত্য চিন্তাজগতে বিশেষ প্রভাব ফেলে। উনিশ ও বিশ শতকে উপনিষদের বহু জার্মান ও ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। তবে ম্যাক্সমুলারই প্রথম উপনিষদের ইংরেজি অনুবাদ গ্রন্থ যথাযথভাবে সম্পাদনা করেন। পরে উপনিষদ্ এবং ষড়্দর্শনের বিশেষ আলোচনা তিনি সংগ্রহগ্রন্থ হিসাবে প্রকাশ করেছিলেন। অনুবাদের কাজ আরও করেছেন রবার্ট আরনেস্ট্ হিউম, পল্ ডয়সেন, কোলব্রুক, অলডেনবের্গ, বার্নেট, সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণণ প্রমুখরা। [এই পাদটীকা অংশের সংযোজন দশদিশি সম্পাদকীয় দপ্তরের পক্ষ থেকে]

ও ইংরাজী ভাষাতেও উপনিষদগুলির অনুবাদ করেন। তিনি যে পাঁচটি উপনিষদের অনুবাদ করেন, তা হল — কেনোপনিষদ্ (জুন, ১৮১৬), ঈশোপনিষদ্ (জুলাই, ১৮১৬), কঠোপনিষদ্ (আগস্ট, ১৮১৭), মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ (অক্টোবর, ১৮১৭) ও মুণ্ডকোপনিষদ্ (ফেব্রুয়ারী, ১৮১৯)।

সেকালের নবজাগরণের পথিক এই রাজা রামমোহন রায় একাধিক দিক থেকে সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। যেমন তিনি রাজনৈতিক, ধর্মেরও সংস্কারক ছিলেন। রাজা রামমোহন রায় প্রথম ভারতীয় যাঁর অনূদিত কঠোপনিষদ্ ও উপনিষদের সঞ্চিত পবিত্রতম একেশ্বরবাদ সম্পর্কে ইউরোপীয়গণ পরিচিত হন। তিনি মক্তবে আরবি, পারসি ভাষায় শিক্ষা লাভ করেন, শিক্ষালাভ করেন কোরানশরীফের, কোরানশরীফের নিহিত চরম একেশ্বরতাবাদ আয়ত্ত করেন ও অধিগত করেন সুফীবাদ। আবার শাক্ত-বৈষ্ণব মিশ্রিত হিন্দু সমাজের বহুদেবতাবাদের শিক্ষাও জন্মভূমির সূত্রে তাঁকে স্পর্শ করেছিল। আবার তিনি পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত। এই বহুদেবতাবাদের নান্তরীয়ক অংশ ছিল সাকারবাদ ও আকারের নানাত্ব। একদিকে পশ্চিমা বিজ্ঞানীদের ভারতীয় সাকারবাদের প্রতি উপহাসদৃষ্টি আর ভারতীয় সমাজের পণ্ডিতদের একচ্ছত্র সামাজিক বিধান আর অপর দিকে ইসলামের একেশ্বরবাদ তাঁর চিত্তভূমিতে আজন্ম প্রোথিত সাকারবাদের শিকড়কে আলগা করে দিয়েছিল। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মসমাজের মধ্য দিয়ে প্রচার করলেন এমন কোনো মতবাদের, যা ইসলামীয় ঈশ্বরতত্ত্বের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ ও পশ্চিমীয় দৃষ্টিতে আদৃত হওয়ার যোগ্য। আর সেই একেশ্বরবাদের উৎসরূপে বেদান্তের শ্রুতিপ্রস্থান উপনিষৎকে খুঁজে পেলেন। তাই উপনিষদের অনুবাদ সেই হাতিয়ার, যার দ্বারা পশ্চিমকে যোগ্য উত্তর দিলেন এবং সাকারবাদে চাপা পড়ে থাকা হিন্দুধর্মের একেশ্বরবাদরূপ সত্যতারও উদ্ধার করলেন। তাই Maurice Winternitz এই দিকটা উল্লেখ করে বলেছেন —

"With the intention of proclaiming this new teaching which was however found already in the ancient holy scripture, and to spread it through the Brahma Samaj (or the Community of God) founded by him, and at the same time with the intention of convincing the Christian theologians and missionaries whom he esteemed, that the best of what they thought was already found in the Upaniṣads, he translated into English a large number of the Upaniṣads and edited some of them in original texts. (A History of Indian Literature, vol.1, Delhi: Motilal Banarasi Das, 1981, 17)"

দ্বিতীয়তঃ, তিনি সমস্ত উপনিষদের ব্যাখ্যা করেননি। কেবলমাত্র পাঁচটি উপনিষৎকে বেছে নিয়েছেন। উপনিষদের মধ্যে আয়তনে ও দার্শনিকবিচারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রসিদ্ধ সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদ্ এবং যজুর্বেদীয় বৃহদারণ্যকোপনিষদের অনুবাদ

না করে কেন তিনি আয়তনে অপেক্ষাকৃত স্বল্প উপনিষৎগুলির অনুবাদ করলেন? এর উত্তর তাঁর অনুবাদের উদ্দেশ্য বুঝলেই বোঝা যাবে। তিনি যতটা না দার্শনিকতার দিকে জোর দিয়েছিলেন, তার চাইতে বেশি ধর্মতত্ত্বসম্বন্ধীয় বিষয়ের দিকে জোর দিয়েছিলেন। ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ও বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ দার্শনিকবিচারে সমৃদ্ধ। এমন নয় যে কঠোপনিষদে কোনো দার্শনিক বীজ নিহিত নেই কিন্তু এই স্বল্পাকার উপনিষৎ যত তাড়াতাড়ি সাধারণ মানুষের নিকটে উপস্থিত হবে বৃহদাকার ঐ ঐ উপনিষদ্ গুলি সাধারণ সংস্কৃতভাষাজ্ঞানহীন ভারতীয় ও অভারতীয় ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হবে না। তাই রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেছেন —"But the motive behind the translations was not so much philosophical as theological. Rammohun did have an axe to grind. His translation activities were an extension of his continuous polemics directed against the European missionaries on the one hand and his co-religionists in Bengal (who upheld the existing Hindu practice of idolatry) on the other." *[Rammohun Roy as Translator of the Upanishads, Page 2]*

তৃতীয়তঃ, তিনি লোকভাষাকে বেছে নিলেন অনুবাদের জন্য। আবার তিনি ইংরেজী ভাষাতেও অনুবাদ করেছেন, যাতে অভারতীয় ইউরোপীয় সভ্যতার কাছে এই উৎকৃষ্ট ধর্মতত্ত্বকে পৌঁছে দিতে পারেন। অনুবাদও নানারকমের হয় —সান্বয়ানুবাদ, আক্ষরিক অনুবাদ ও ভাবানুবাদ। তিনি ভাবানুবাদ-ই গ্রহণ করেছেন অধিকাংশস্থলে। কেন তিনি ভাবানুবাদ গ্রহণ করলেন —এরও পশ্চাতে তাঁর পূর্বোক্ত উদ্দেশ্যই বর্তমান। তিনি প্রতিপদার্থ অন্বয় প্রদর্শন করে প্রতিপদার্থের বোধ করাতে চাননি। তিনি টোলের পণ্ডিতদের ভূমিকা পালন করতে চাননি, যাতে করে প্রতিপদের উপর টিপ্পনীসহ সুগভীর জ্ঞান পাঠকদের হবে। — "রামমোহনের সমকালে টোল চতুষ্পাঠীতে হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের চর্চা ছিল তবে সে পদ্ধতি ছিল অবৈজ্ঞানিক ও প্রতিক্রিয়াশীল। তা ছিল নিতান্ত কেতাবি। পাঠার্থীরা সেখানে কেবল পুঁথির পংক্তি ও শব্দ ধরে ব্যাখ্যা করতেন, ব্যাকরণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সূত্র নিয়ে আলোচনা করে যেতেন। তাঁদের সম্পর্ক ছিল না বহির্বিশ্বের সঙ্গে।" (ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় উপনিষদ্ চর্চা, পৃষ্ঠা ৫১) এর দ্বারা এটা বোঝায় না যে, টোলের পঠনকৌশল একেবারেই গ্রাহ্য নয়, কিন্তু তিনি শুধু চেয়েছিলেন বোঝাতে হিন্দুধর্মের মূল ধ্বনিও গাঁথা আছে এক ব্রহ্মে। এটুকু বোঝাতে তাঁর ভাবানুবাদ কোনো দিক থেকেই খামতি রাখেনি।

চতুর্থতঃ, তিনি যে ধর্ম সংস্কার করার উদ্দেশ্যে উপনিষদের অনুবাদ করেছেন, সে সংস্কার বলতে কী বোঝায়? সংস্কার বলতে গুণাধানকে বোঝায়। ব্রাহ্মণও সংস্কার লাভ না করে বেদের অধ্যয়নে অধিকারী হন না। তাই উপনয়ন সংস্কারের দ্বারা আহিতগুণ হয়ে দ্বিজতা লাভ করে। একইরকমভাবে সমাজে সাকার-নিরাকার

উভয়পক্ষে প্রচলিত ধর্মমতকে কেবলমাত্র একেশ্বরবাদে গেঁথে সেই ধর্ম সংস্কার করেছেন। কিন্তু এই মতবাদ সত্য বলে লোকসমাজে তখনই আদৃত হবে, যদি এর পশ্চাতে কোনো প্রমাণ থাকে। যদি মনোরাজ্য-বিজৃম্ভিত হয়, তাহলে তা গল্পের মতো ক্ষণস্থায়ী হয়। প্রমাণ রূপে বেছে নিলেন বেদান্তের শ্রুতিপ্রস্থানকে —ধর্মগ্রন্থ বেদেরই এক অবয়বকে। তাই সনাতন সেই একেশ্বরবাদকে সামনে তুলে ধরলেন সনাতন হিন্দুধর্মের উপনিষদ্ থেকে। সংস্কারে ধর্মীর পরিবর্তন হয় না কিন্তু ধর্মীই নতুনরূপে মানুষের সামনে উপস্থিত হয়। ঠিক যেমন মার্টিন লুথার ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে ধর্মসংস্কার করেছিলেন বাইবেলের হিব্রু ভাষা থেকে আধুনিক ভাষায় অনুবাদ করে। সেই কারণে রাজা রামমোহন উপনিষদ্গুলির আধুনিক ভাষায় অনুবাদ করেন। মুক্ত করেন সংস্কৃত ভাষার মোড়কে বদ্ধ ঔপনিষদ তত্ত্বকে। পৌঁছে দেন সেই তত্ত্বকে আপামর মানুষের চিত্তসমুদ্রে আধুনিক ও লোকভাষানদীতে ভাসিয়ে দিয়ে।

পঞ্চমতঃ, ঊনবিংশ শতকের গোড়ায় ভারতবর্ষের ভূমি সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ নানা কুসংস্কারের আঁধারে আচ্ছাদিত ছিল। সেই ভারতভূমিতে একদিকে তরুণ ডিরোজিও ও রাজা রামমোহন রায়ের হাত ধরে ইউরোপীয় সংস্কৃতির আলোক আছড়ে পড়েছিল। তখন তরুণদল দুটি বিভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। বাস্তব যুক্তিবাদী বিজ্ঞানমনস্কতায় ডিরোজিও-এর আদর্শে অনুপ্রাণিত এক তরুণদল যেখানে প্রাচ্যের ধর্মতত্ত্বকে মিথ্যা বলে মনে করছিল ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি, ধর্মতত্ত্বকেই সত্য বলে আঁকড়ে ধরছিল, তখন উপনিষদের অনুবাদ করে বেদান্ত তত্ত্বকে তরুণদের মধ্যে তুলে ধরে যেন তার প্রতিবাদ করলেন যে, অন্তত প্রকৃত ধর্মতত্ত্ব জানার জন্য হিন্দুধর্মগ্রন্থ ত্যাগ করার কোনো প্রয়োজন নেই। সেই রাজনৈতিক প্রতিবাদও যেন এই অনুবাদগুলি অন্তরালে করে গেছে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে কুসংস্কার প্লাবন কালের নদীতে এসে হিন্দু ধর্মের সমাজকে প্লাবিত করেছিল, সেখানে বেদান্ততত্ত্বের বাঁধ দিয়ে মেরামতির কাজ রাজা রামমোহন রায় করেছিলেন সত্য কথা, কিন্তু সেই হিন্দু ধর্ম সমাজের আর একটি অযাচিত ফাটল তৈরী হয়ে গেল। একথা সত্য, যে সাকার পৌত্তলিকতাবাদে পুরোহিতকুলের উদ্ভাবিত কুসংস্কার এসে উপস্থিত হয়েছিল, তা তিনি দূর করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন, "সাকার উপাসনায় পুরোহিতকুলের সমৃদ্ধি আছে। তাই পুরোহিতকুলেরই কৃত্যতায় সনাতন হিন্দুধর্মের এক ব্রহ্মের নিরাকার উপাসনা সাকার উপাসনায় চাপা পড়ে গেছে। (ভট্টাচার্যের সহিত বিচার)

কিন্তু কেবল নিরাকার সাধনা বেদ-বেদান্ত প্রতিপাদ্য নয়, সাকার উপাসনাও হিন্দুধর্মের পরিখার অন্তঃপাতী । এই দিকটা তিনি প্রায় ধূলিসাৎ করে দিয়েছিলেন। আমাদের বক্তব্য এই যে, বেদে এমনকি বেদান্তে সগুণ ব্রহ্মের ন্যায় নির্গুণ ব্রহ্মের এবং সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার ন্যায় নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনাও কথিত হয়েছে। সগুণ

ব্রহ্মও যে বেদের প্রতিপাদ্য তা শাঙ্করভাষ্যে বলা হয়েছে — "দর্শয়তি চ বেদোঽপি সর্ববেদান্তেষু বৈদ্যৈকত্বোপদেশাৎ — 'সর্বে বেদা যৎপদমাননন্তি' ইতি 'তথৈতং হ্যেব বহ্বৃচা মহত্যুকেথ মীমাংসন্ত এতমগ্নাবধ্বর্যব এতং মহাব্রতে ছন্দোগাঃ' ইতি..... তথা সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ত্বেন অন্যত্র বিহিতানামৃকথাদীনামন্যত্রোপাসনবিধানায় উপাদানাৎ প্রায়দর্শনন্যায়েন উপাসনানামপি সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ত্বসিদ্ধিঃ"। (৩.৩.৪ শাঙ্করভাষ্য)

সমস্ত বেদ-বেদান্ত এর তাৎপর্য নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম ও তার উপাসনাতে। তবুও বেদ-বেদান্তে কেন সগুণ ব্রহ্মের প্রপঞ্চন হয়েছে? কেন সগুণব্রহ্মের উপাসনা কথিত হযেছে? দুটি কারণে হতে পারে — একটি হল, পূর্বপক্ষরূপে সগুণব্রহ্মের উপাসনা কথিত হয়েছে যার খণ্ডনপূর্বক নির্গুণব্রহ্মের উপাসনা বেদ-বেদান্তের প্রতিপাদ্য হবে। আর দুই, নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা যেমন মোক্ষলাভের একটি উপায়, তেমন সগুণ ব্রহ্মের উপাসনাও অপর একটি উপায়। এর মধ্যে প্রথম পক্ষটি ঠিক নয়। যদি তাই হতো, তাহলে বেদ-বেদান্তে কোনো না কোনো স্থানে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম ও তদুপাসনার খণ্ডন থাকতো, অথচ তা নয়। তবে দ্বিতীয় পক্ষটিই সমস্ত বেদবাদী ও বেদান্ত-বাদীদের অভিপ্রেত। কেননা সকলে নির্গুণ উপাসনা করতে পারেন না। যারা মন্দ ও মধ্যম অধিকারী, তাদের জন্য সগুণ উপাসনা বিহিত হয়েছে। কঠোপনিষদে ওঁকারকে (সগুণ ব্রহ্ম উপাসনোর) শ্রেষ্ঠ আলম্বন বলা হয়েছে — "এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্" (১/১৭)। শঙ্করাচার্য এর ব্যাখ্যায় বলেছেন — "আলম্বত্বেন প্রতীকত্বেন চোঙ্কারো নির্দিষ্টঃ, অপরস্য চ ব্রহ্মণো মন্দমধ্যমপ্রতিপত্তৃন্ প্রতি"

তবে বহমান নদী যখন স্রোত হারিয়ে শৈবালদামে বদ্ধ হয়, রুদ্ধগতি হয়, বহমানতা হারিয়ে নিজের চলনস্বভাব স্বরূপ থেকে চ্যুত হয়, নিজেকে হারিয়ে ফেলে, তখন দরকার হয়, সেই শৈবাল দাম সরিয়ে নিজের গতিতে ফিরিয়ে আনার, স্রোতহীন নদীকে জোয়ার জলে ভরিয়ে তোলার। সেই সমাজ আর ধর্মের সংস্কারে রাজা রামমোহন রায় যে সফল হয়েছিলেন তাই নয়, সেই দুর্দিনকে জয় করার সাথে সাথে তিনি কালজয়ী হয়ে রয়ে গেছেন। সেই প্রাচীন কুসংস্কার জয়ে দুই শতক আগে কীভাবে আধুনিক সংস্কৃতিমনোভাব তাঁর মধ্যে বাসা বেঁধেছিল তা ভেবে অবাক হতে হয়।

রাতের আকাশে ধুমকেতু উদিত হয়ে ক্ষণিকের মধ্যেই মাটিতে আছড়ে পড়ে। ঠিক তেমনই ঊনবিংশ শতাব্দীতে এক ঝাঁক মনীষী ভারতভূখণ্ডে যেন আছড়ে পড়েছিলেন। শুধু তফাত এইখানে, রাতের আঁধার আকাশে তারারা মাটিতে এসে নিষ্প্রভ হয়ে যায়, কিন্তু এই মনীষীরা নিজ নিজ প্রতিভায় চারিদিক আলোকিত করে তোলেন। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — এই মনীষীরা নিরাকার ব্রহ্মবাদকে সাকার

মানবতাবাদে রূপ দিলেন, মুনিঋষিদের অলৌকিক তত্ত্বকে লৌকিক করে সকল সাধারণ মানুষের হাতের মুঠোয় এনে দিলেন — এক কথায় বনের বেদান্তকে ঘরের মানবসেবায় পরিণত করলেন। স্বামীজী বলছেন, "বেদান্তের এই সকল মহান তত্ত্ব কেবল অরণ্যে বা গিরিগুহায় আবদ্ধ থাকিবে না; বিচারালয়ে ভজনালয়ে দরিদ্রের কুটীরে -/ সর্বত্র এই সকল তত্ত্ব কার্যে পরিণত হবে" 1 (বাণী ও রচনা ৫,১৩৭ পৃষ্ঠা)। রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ নিবারণের জন্য কঠোপনিষদ্ ও মুণ্ডকোপনিষদ্ থেকেও উদ্ধৃতি দিতেন। শুধু নিরাকার একেশ্বরবাদকে সমাজজীবনে প্রবাহিত করাই নয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এবং সেই সাথে হিন্দু মুসলমানের সমন্বয় সাধনের উপাদান রাজা রামমোহন রায় উপনিষদের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন। ঐ পবিত্র উদ্দেশ্য সিদ্ধি উপনিষদের অনুবাদের মধ্যে দিয়ে করে গেছেন এবং সেই স্রোতে রমেশচন্দ্র দত্তও নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। এই বেড়া ভাঙার কাজ সচেতন ভাবে যে রাজা রামমোহন রায় ও আম্রবৃক্ষন্যায়ে রমেশচন্দ্র দত্ত করে গেছেন, সেই তাঁদের বেড়া ভাঙা তত্ত্বকে দুই শত বৎসর পরেও কোথাও যেন আমরা সর্বতোভাবে আলিঙ্গন করে উঠতে পারিনি।§

---

§ অন্যান্য বঙ্গানুবাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাংলা ১৩০০ সালে 'হিন্দুশাস্ত্র' গ্রন্থে সংকলিত সত্যব্রত সামশ্রমী ও রমেশচন্দ্র দত্তর উপনিষদ্ সংগ্রহ। এছাড়া আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ বেদান্তসারের, কালীবর বেদান্তবাগীশ শঙ্করভাষ্য ও যোগবাশিষ্ঠের, প্রমথনাথ তর্কভূষণ বেদান্তের মায়াবাদের সহজ বঙ্গানুবাদ করেছেন। বিশিষ্ট চিন্তক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন ও প্রসারের জন্যে বাংলা ভাষায় কৃতিত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। বাংলা ১৩৪৮ সালে স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত তিন খণ্ড 'উপনিষৎ গ্রন্থাবলী' কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটি উল্লেখযোগ্য অনুবাদকর্ম। ১৩৫৩ সালে আরও পাওয়া যায় বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ ৫৮-য় বিধুশেখর শাস্ত্রীর উপনিষদের বাংলা অনুবাদ। বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত 'উপনিষদ গ্রন্থাবলী' আর একটি সহজবোধ্য উপনিষদের বঙ্গানুবাদ গ্রন্থ। মূল গ্রন্থটি প্রায় দুর্লভ হবার পর ৫০টি উপনিষদের বঙ্গানুবাদ সম্বলিত তিন খণ্ডে প্রকাশিত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত হয় সংস্থার পরিবর্তিত নাম বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড থেকে। **[এই পাদটীকা অংশের সংযোজন দশদিশি সম্পাদকীয় দপ্তরের পক্ষ থেকে]**

টীকা

১ চিত:- চিতোঽন্ত উদাত্তো ভবতি। — চিতি প্রত্যয়ে প্রকৃতিপ্রত্যয়সমুদায়স্যান্ত উদাত্ত ইষ্যতে। (কাশিকা) পদটির পাঠ থাকায় এবং [২]বৃষাদিগণে পঠিত পদগুলি আদ্যুদাত্ত বলে বিহিত হওয়ায় এই অচ্ প্রত্যয়ান্ত 'বেদ' পদটি আদ্যুদাত্ত হয়। পদটির স্বরসংস্থান হয় এরকম- 'বেদ।:'। আবার, [৩]'হলশ্চ' (৩.৩.১২১.)এই সূত্রে করণবাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় হয়। এর অর্থ হয় জ্ঞানের সাধন বা উপায়। যার দ্বারা জানা যায়, তাই হল বেদ। এই করণ অর্থে ঘঞন্ত বেদপদটি [৪]'ঞিনত্যাদির্নিত্যম্' (৬.১.১৯৭.) এই সূত্রে আদ্যুদাত্ত হওয়ার কথা। কিন্তু [৫]উঞ্ছাদিগণে পঠিত শব্দগুলি অন্তোদাত্ত বলে বিহিত হয়েছে। ঐ গণে পঠিত পদগুলির মধ্যে করণবাচ্যে নিষ্পন্ন বেদ পদটিও পঠিত হওয়ায় বেদপদটি অন্তোদাত্ত বলে নিশ্চিত হয়েছে। এর স্বরসংস্থান হয় এরকম — 'বেদ:'। [৬]"ভাবে" (৩.১.১৮.) এই সূত্রেও ঘঞ্ প্রত্যয়ে বেদশব্দটি নিষ্পন্ন হয়। এক্ষেত্রেও শব্দটি হয় .....

২ (বৃষাদীনাঞ্চ —বৃষ ইত্যেবমাদীনামাদিরুদাত্তো ভবতি। বৃষ:। জন:। গ্রহ:। হয়:। গয়:। এতে সর্বে পচাদ্যচ্ প্রত্যয়ান্তা:। গয় ইত্যত্র গায়তের্নিপাতনাদেত্বম্ নয়:। তয়:। পয়:। বেদ:। অংশ:। দব:। এতেঽপি তথৈব অচ্ প্রত্যয়ান্তা:। (কাশিকা)

৩ হলশ্চ — পুংসি সংজ্ঞায়াং করণাধিকরণয়োশ্চেতি সর্বমনুবর্ততে। হলন্তাদ্ ধাতো: করণাধিকরণয়ো: ঘঞ্ প্রত্যয়ো ভবতি। ঘস্যাপবাদ:। লেখ:। বেদ:। বেষ্টা:। বন্ধ:। মার্গ:। অপামার্গ:। বীমার্গ:। (কাশিকা)

৪ ঞিনত্যাদির্নিত্যম্ —ঞিতি নিতি চ নিত্যমাদিরুদাত্তো ভবতি। (কাশিকা)

৫ উঞ্ছাদীনাঞ্চ — উঞ্ছ ইত্যেবমাদীনামন্ত উদাত্তো ভবতি। উঞ্ছ:। ম্লেচ্ছ:। জঞ্জ:। জল্প:। এতে সর্বে ঘঞন্তা ইতিঞিত্স্বর: প্রাপ্ত:। জপ:। ব্যধ ইতি অবন্তৌ, তয়ো: ধাতুস্বর: প্রাপ্ত:। — *বেদবেগচেষ্টবন্ধা: করণে* হলশ্চেতি ঘঞন্তা এতে করণেঽন্তোদাত্তা ভবন্তি। ভাবে আদ্যুদাত্তা এব। (কাশিকা)

৬ ভাবে —ভাবে বাচ্যে ধাতোর্ঘঞ্ প্রত্যয়ো ভবতি। (কাশিকা) ❑